বউপোড়ানে বাড়ি

কুণ্ডুমশাই যখন জয়মঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার হয়ে এলেন, তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি। আমাদের স্কুলটা ছিল প্রাইভেট স্কুল। মেয়েদের স্কুল হলেও মাত্র দু'একজন দিদিমণি ছিলেন। বাদবাকি, মাস্টারমশাইরাই চালাতেন স্কুলটা। তাঁরা বেশীর ভাগই স্থানীয় বাসিন্দা। চাকরি-বাকরি থেকে অবসর নেবার পর শিক্ষকতা করে সামান্য উপার্জন করতেন। এছাড়া বেকার ছেলে ছোকরা, স্কুল কলেজের পড়া সেরে চাকরির আশায় দিন গুনছে যারা, জয়মঙ্গলার কৃপায় তাদেরও পকেট খরচাটা জুটে যেতো পাকা চাকরি পাওয়া তক্।

কুণ্ডুমশাই যে অন্যান্য মাস্টারমশাইদের থেকে সর্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র তা বুঝতে বেশীদিন লাগলো না গর্দানিবাগের বাঙালী বাসিন্দাদের। মেদবিহীন দীর্ঘ ঋজু দেহ, দুধে আলতায় গোলা রঙ, পরনের ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি, আলো ঠিকরে পড়া বোতাম আঙটি, সোনার ব্যাণ্ডওলা ঘড়ি, সব কিছু থেকেই যেন অনবদ্য আভিজাত্য ঝরে পড়ছে।

কুণ্ডুমশাই এসেছিলেন কোলকাতা থেকে, জয়মঙ্গলায় কর্মখালির সংবাদ পেয়ে। ওখানকার জলবায়ু নাকি ইদানীং আর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকুল নেই তাঁর, প্রায়ই অজীর্ণ, অম্বলে ভুগছেন, তাই বিহারে আস্তানা গাড়তে চান এবার। একটা ভাল বাড়ি পেলেই পরিবারবর্গকে নিয়ে আসবেন। তার ছেলেটিও নাকি ঐ একই ব্যারামে কাবু হয়ে পড়েছে ইদানীং। বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল। আমাদেরই পাড়ায় মারোয়াড়ীদের একটা বাড়ি খালি পড়েছিল কিছুদিন ধরে। কুণ্ডুমশাই বাড়িখানা পছন্দ করে সেটি ভাড়া নয়, একেবারে কিনেই নিলেন গর্দানিবাগের বাঙালীমহলকে শ্রদ্ধাভিভূত করে দিয়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পরিবার এসে পৌঁছলো। ছেলে রূপেন্দু - যে

দেখতে একজন বিখ্যাত চিত্রতারকার মত - জয়মঙ্গলা স্কুলে যোগ দিলো বাংলার মাস্টার রূপে। রূপেন্দুর এক দিদি ছিল, নাম ললিতা। কি দারুণ সুন্দর দেখতে ! বাড়ির সবাই সুন্দর, সুন্দরের গুষ্টি যাকে বলে। কুণ্ডুমশাই, তাঁর স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে - প্রত্যেকেরই রঙ যেন ফেটে পড়ছে, ধনুকের ছিলার মত ছিপছিপে শরীর, চোখ মুখ নাক যেন কোন শিল্পী সযত্নে তুলি দিয়ে এঁকেছে অনেক মনোযোগ দিয়ে। আর তেমনি তাদের পোশাক-আশাক। কি সুন্দর আর দামী দামী জামাকাপড়, গয়নাগাটি পরতো কুণ্ডুমশাইয়ের মেয়ে আর বউ। ছেলে রূপেন্দু যখন সেজেগুজে ক্লাস নিতে আসতো, লেখাপড়ায় ভালো মেয়েরাও পড়া ভুলে হাঁ করে চেয়ে থাকতো তার দিকে।

এক পাড়াতে থেকেও তাদের সঙ্গে খুব একটা অন্তরঙ্গতা হয়নি কারও। অবশ্য তার জন্য পুরোপুরি তাদের দায়ী করা চলে না। পাড়ার লোকেরা তাদের যে অহঙ্কার ও দেমাক দেখতো, তার অনেকখানিই হয়তো তাদের নিজেদের পরশ্রীকাতর মনের প্রতিক্রিয়া ছিল। যাই হোক, বিশেষ কারণ ছাড়া যাওয়া আসা ছিল না বড় একটা। এই জন্যই কুণ্ডুপরিবারের অবশিষ্ট প্রাণীদের কথা পাড়ার লোকেরা টের পায়নি বহুদিন এবং টের পেলেও তা বুঝতে ও বিশ্বাস করতে সময় লেগেছিল ঢের।

কালোমত ঘোমটা টানা একটা বউকে ওদের বাড়ি ঝাঁটপাট যাবতীয় সংসারের কাজ করতে দেখা যেতো। সাজপোশাক, মুখ-চোখের গড়ন দেখে ঝি চাকর বলেই মনে হ'ত। হাবেভাবেও। মানুষজন দেখলেই সরে যেত আড়ালে আবডালে। কেমন একটা শঙ্কিত বিষণ্ন হাসি লেগে থাকতো মুখে। কুণ্ডুমশাইরা যে কোলকাতার বনেদি বড়লোক, একথা তাদের দেখেই বুঝে নিয়েছিল সবাই, কাজেই তাদের বাড়ির কাজকর্ম করার জন্যে চব্বিশ ঘন্টার বাঁধা ঝি থাকবে এটা একটুও অপ্রত্যাশিত বলে মনে হয়নি তাদের। এবং এরপর ক্রমে ও বাড়িতে কালো-কোলো ছোট দু'টি মেয়েকে যখন মাঝেসাঝে দেখা যেতে লাগলো, তখন তাদের ঝিয়ের মেয়ে বলেই ধরে নিলো সবাই, চেহারা সাজপোশাক ও হাবভাব দেখে।

রায়গিন্নী এ পাড়ার জাঁদরেল মহিলা। সকলেই মান্য করে তাঁকে।

একদিন পানের ডিবে থেকে দোক্তা বার করে গালে পুরে বললেন, "কোলকাতা শহরে কি বলে যে থাকে লোকে মা ! আমার তো কোলকাতার নামে ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়। কত ঠগ জোচ্চুরি; দিনে দুপুরে পুকুর চুরি যে হচ্ছে ওখানে ----।"

মা বিস্মিত কন্ঠে প্রশ্ন করলেন, "কেন মাসিমা, কি হ'ল আবার?"

রায়গিন্নী দু'চোখ বিস্ফারিত করে গলা নামিয়ে বললেন, "কুণ্ডুমশাইয়ের পুত্রবধূকে দেখেছো? কনে পাল্টে না কি করে ওই কালো, কুচ্ছিত মেয়েটাকে অমন রাজপুত্তুরের গলায় গেঁথে দিয়েছে।"

বারান্দায় বই খুলে কান খাড়া করে বসে আছি। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার। ফিল্মস্টার স্বপনকুমারের মত দেখতে রূপেন্দু স্যারের বউ নাকি ওই কালো কুচ্ছিত মেয়েলোকটা, যে শস্তা মিলের শাড়ি পরে অষ্টপ্রহর খাটাখাটনি করে ওই বাড়িতে। শুধু তাই নয়। ক্ষুদে চোখ, খ্যাঁদা নাক মেয়ে দুটো নাকি রূপেন্দু স্যারের মেয়ে। তারই ঔরসে জন্মেছে ওই হতকুচ্ছিত মেয়েলোকটার পেটে।

রায়গিন্নী উত্তেজিত কন্ঠে বলছেন, "ওরা বলে ওই বউ ঘরে নিয়েছে, অন্য কেউ হলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতো। দিয়ে আবার নতুন করে বিয়ে দিতো ছেলের ----।"

কুণ্ডুমশাইরা গর্দানিবাগে আসার পর কয়েক বছর কেটে গেছে। সে বছর আমার বোর্ড পরীক্ষা। আমার ছোড়দি সেবার ম্যাট্রিক দেবে। আমাদের কপালক্রমে সেই বছরই বিহারে বিজলী সাপ্লাইয়ে ভীষণ গোলমাল দেখা দিল। গুমোট গরমে সারাদিন প্রাণ যায়। রাত্রে ছাদে তালপাতার পাখা দিয়ে মশা তাড়াতে তাড়াতে হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় দুই বোনে বসে রাত জেগে পরীক্ষার পড়া তৈরী করতাম। এর মাস আষ্টেক আগে ললিতার বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে দানাপুরের। সম্প্রতি ললিতা সন্তানসম্ভবা হয়েছে। ওর শ্বশুরবাড়ির প্রথা অনুসারে প্রথম সন্তান ওখানেই ভূমিষ্ঠ হবে, কুণ্ডুমশাই ও তাঁর স্ত্রী আক্ষেপ করে জানালেন সবাইকে।

আজ ললিতার সাধ। তত্ত্ব সাজিয়ে নিয়ে রূপেন্দু ও তার মা সন্ধ্যের ট্রেনে রওনা হয়ে গেছে। বাড়িতে কুণ্ডুমশাই ছাড়া আছে তাঁর কুরূপা পুত্রবধূ ও দুই নাতনি। তাদের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দুপুরে

ওবাড়িতে বেশ বড়রকম ঝড় বয়ে গেছে আজ। পাড়াপ্রতিবেশীরা অজ্ঞতার ভান করলেও আসল ব্যাপারটা জানতে বাকী নেই কারও। না জেনে উপায়ও ছিল না। শহরবাজারে গায়ে গায়ে বাড়ি সব। শাশুড়ি, শ্বশুর, স্বামীতে মিলে বউকে আগাপাস্তালা ঠ্যাঙানোর খবর চাপা থাকার কথা নয়। বিশেষ করে সে সময় মেজাজ বা রসনায় লাগাম টানেনি যখন কেউ।

এমন কি সেই সদাশঙ্কিত বশংবদ বউও চিৎকার করে কেঁদে বলেছে, "কেন যাবে না ওরা? পিসির সাধে সবাই যাবে, ওই বাচ্চাদুটোই শুধু যেতে পারবে না? কালো, তাতে হয়েছে কি? সে ওদের বরাত। তাই বলে সব কিছুতে বঞ্চিত হয়ে থাকবে?"

কুণ্ডুগিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "বলি তোমার না হয় ঘেন্নাপিত্তি নেই, আমাদের তো সে সব শেষ হয়ে যায়নি ! রূপু বলে তোমায় সহ্য করে, অন্য কেউ হলে ঘেন্নায় ছুঁতেও পারতো না। ওই একজোড়া হোঁদলকুতকুতের ছানাকে নিজের নাতনি বলে পরিচয় দেবো দশজন আত্মীয়-কুটুম্বের মাঝে? তারপর ললিতার আর মুখ থাকবে ও বাড়িতে? বলি মুখ খোলার আগে আয়নায় নিজের মুখখানা একবার ভাল করে দেখেছ?

বউটি কান্নাজড়ানো গলায় আবার কিছু বললো।

সঙ্গে সঙ্গে একজোটে ফেটে পড়লো ওরা, "কি? কি? কি বললে? যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা! ওই মুখ যদি একেবারে থেঁতলে না দিয়েছি তো আমার নাম নেই ----।"

কথা ছিল কুণ্ডুমশাইও যাবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যাত্রা রদ করে উনি রয়ে গেলেন। শুধু রূপেন্দু তার মাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সাধের তত্ত্বতলাশের ঝুড়ি-বাক্স সাজিয়ে নিয়ে।

রাত বোধহয় দশটা কি এগারোটা হবে। ঘুমে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। হাতের তেলোয় হাই আটকে অদেখা চোখে বইয়ের পাতার দিকে চেয়ে আছি প্রাণপণে।

ছোড়দি থেকে থেকে নিজের বই থেকে চোখ সরিয়ে আমার দিকে

চেয়ে অনুনয়ের সুরে বলছে, "লক্ষ্মী কুটুন, সোনা কুটুন, আর একটু পড় ভাই। দিনের বেলা যা ভ্যাপসা গরম, কিচ্ছু মাথায় ঢোকে না। এইবেলা একটু পড়ে নে।"

আমি ঘুমোতে গেলে ছোড়দিকেও পড়া বন্ধ করে নীচে চলে যেতে হ'বে। ছাদে একা থাকতে ভয় করবে ছোড়দির। তাই ওর খাতিরেই কষ্টেসৃষ্টে ঘুম চেপে কোনমতে খাড়া হয়ে বসে আছি। আমার তো পড়া হচ্ছে ছাই, তবু ছোড়দির যদি একটু পড়া হয়, এই ভেবে।

ঢুলতে ঢুলতে কেমন তন্দ্রা মত এসে গিয়েছিল।

হঠাৎ ছোড়দি গায়ে ঠ্যালা দিয়ে সভয়ে বললো, "কুটুন, কুটুন, ওই দ্যাখ্।"

চমকে তাকালাম। সামনে কুণ্ডুমশাইদের উঠোনে কেমন একটা আলোর ঝলমলানি। এক ঝলক দেখলাম শুধু। তারপর আবার অন্ধকার।

বললাম, "ওটা কি রে ছোড়দি?"

ছোড়দির মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, "ও বাড়ির কালো বউটা। সারা গায়ে আগুন মেখে ছুটে উঠোনে এসে আবার ঘরে ঢুকে গেল। তুই দেখিসনি?"

প্রথমে মনে হল ছোড়দিও বোধ হয় আমার মত ঘুমিয়ে পড়েছিল। বই মুখে করে ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু আমিও তো ওদের উঠোনে এক ঝলক আলো দেখলাম। দু'জনে একসঙ্গে একরকম স্বপ্ন দেখা কি সম্ভব? যা দেখলাম, সে কি শুধু স্বপ্ন? পাড়া নিশুতি। কিন্তু কুণ্ডুমশাইদের বাড়ির অভ্যন্তরে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কেমন একটা গোঙানির মত। মেঝেতে কিছু ঘষ্‌টে নিয়ে যাচ্ছে যেন কেউ, দরজা জানলা বন্ধ করছে অতি সন্তর্পণে। আমরা দু'জনে নীচে এসে মাকে জাগালাম। বললাম সব। ভেবেছিলাম মা ধমকে উড়িয়ে দেবে দিবাস্বপ্ন বলে। কিন্তু না। ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে মুখ করে শুনলেন মা। ছুটে গিয়ে বাবাকে জাগালেন।

বাবা বললেন, "তোমরা থাকো, আমি দেখছি।"

বাবা বাইরে বেরিয়ে দেখেন রায়মশাই, চৌধুরীমশাই, পাকড়াশিবাবু,

গেনুবাবু, এরা সবাই জড়ো হয়ে উত্তেজিত চাপা গলায় কথা বলছেন। ওঁদের পিছনে বাড়ির মেয়েরা রয়েছেন। মায়ের পিছু পিছু আমি আর ছোড়দি রাস্তায় নেমে এলাম।

একটানা অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর কুণ্ডুমশাইয়ের গলা পাওয়া গেল, "কে? এত রাত্রে কিসের দরকার?"

সমবেত ভদ্রলোকেরা কুন্ঠিত কন্ঠে বললেন, "আমরা কুণ্ডুমশাই, দরজাটা একটু খুলুন।"

কুণ্ডুমশাই দরজা ফাঁক করে বাইরে বেরিয়ে এসে দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন, "কি ব্যাপার, আপনারা এমন অসময়ে? কি হয়েছে?"

গেনুবাবু কুন্ঠিত স্বরে বললেন, "ইয়ে ---- মানে ---- আপনার বাড়ির উঠোনে একজন মেয়েমানুষকে দেখেছে এরা। সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে।"

কুণ্ডুমশাই কন্ঠে বিরক্তি ঢেলে বললেন, "রাত দুপুরে অসুস্থ বুড়োমানুষকে ঘুম থেকে তুলে রসিকতা করতে এসেছেন আপনারা? এ কি ভদ্রলোকের কাজ?"

সবাই ভড়কে গেল ওঁর কথাবার্তা ভাবভঙ্গিতে। অনেকে পিছিয়ে আসছিলেন। গেনুবাবু একটু কর্তাব্যক্তি গোছের লোক এ পাড়ায়।

সবিনয়ে বললেন, "কিছু মনে করবেন না কুণ্ডুমশাই। ওরা সবাই বলছে উঠোনে আপনার বউমাকে পুড়তে দেখেছে। হয়তো দেখার ভুলও হতে পারে, কিন্তু এতজনে বলছে যখন। আপনি দয়া করে বউমাকে একটু ডাকুন। আমরা দেখে এক্ষুণি চলে যাবো।"

কুণ্ডুমশাই চটে উঠে বললেন, "কি? রাতদুপুরে আমার বউমাকে দেখার সাধ? ইয়ার্কি মারার জায়গা পাননি? এক্ষুণি চলে যান বলছি। নইলে পুলিস ডাকবো ----।"

"সে কষ্ট আর আপনাকে করতে হবে না। আমরাই ডাকবো। বউমা কোথায়? দরজা ছাড়ুন, আমি ভিতরে যাবো।" রায়গিন্নী কখন যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ।

কুণ্ডুমশাই হঠাৎ কেমন ঘাবড়ে গেলেন।

আমতা আমতা করে বললেন, "বউ মানুষ। দু'টো বাচ্চা। সারাদিন খাটাখাটনির পর একটু ঘুমিয়েছে বেচারী ---- " কন্ঠে বাৎসল্যের রস ঝরে পড়ছে যেন।

রায়গিন্নী ওঁকে ঠেলে দরজা খুলে বললেন, "ভাববেন না, বেশী দেরী হবে না।"

ওঁর পিছন পিছন পাড়ার মহিলারা ঢুকলো। বউমানুষ ঘুমোচ্ছে। তার শোবার ঘরে পুরুষেরা ঢুকবে কি করে তাই তাঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কুণ্ডুমশাই মাটিতে পা ঠুকে বললেন, "যত্ত সব!"

তারপর ধপাস্ করে সেখানেই বসে পড়লেন।

ঘরে ঢুকে রায়গিন্নী টর্চ জ্বাললেন। অন্ধকারে টর্চের স্বল্প আলোয় প্রথমে ঠাহর হচ্ছিল না। ঠিক দেখছি কিনা এবং যা দেখছি তা ঠিক হওয়া সম্ভব কিনা এই দ্বন্দে কেটে গেল মুহূর্তকাল। তারপর তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে উঠলো সমবেত প্রতিবেশিনীরা। ঘরের মেঝের উপর মশারি খাটানো রয়েছে। সেই মশারির মধ্যে নগ্ন মেঝের উপর দগ্ধদেহ বউটা পড়ে আছে। থেকে থেকে যন্ত্রণায় খিঁচ দিয়ে উঠছে তার আগুনে পোড়া বিকৃত শরীরটা।

রায়গিন্নী মশারী তুলে মুখের উপর ঝুঁকে আর্ত কন্ঠে ডাকলেন, "বউমা, ও বউমা, চোখ চাও।"

ঠোঁট দু'টো একটু যেন নড়ে উঠলো। রায়গিন্নী মুখের কাছে কান পাতলেন।

তারপর সরে এসে বললেন, "বললো, মেয়ে দু'টো রইলো।"

একটু পরেই অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। বউটাকে ধরাধরি করে তুললো সবাই। একজন বললো, "কুণ্ডুমশাই, আপনিও চলুন।"

কুণ্ডুমশাই সজোরে মাথা নাড়তে লাগলেন। তাঁর মাথানাড়া অগ্রাহ্য করে জোর করে গাড়িতে তুলে দিল সবাই। পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোক ও ছেলেছোকরা সঙ্গে গেল। আমার বড়দাও গিয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি করে অনেকে ফিরে এলো। দু'একজন রয়ে গেল হাসপাতালেই।

শোনা গেল কুণ্ডুমশাই নাকি হাসপাতাল অবধি যাননি। পথে কোথায় নাকি মুহূর্তকাল থেমেছিল অ্যাম্বুলেন্স, সবার অলক্ষ্যে নেমে পড়েছেন তখন ----।

সেদিন সকালে কারও বাড়ি উনোনে আগুন পড়েনি। শুকনো মুখে বসে আছে সবাই, আহা কখন খবর আসবে যে বউটা একটু ভাল আছে, প্রাণে বাঁচার আশা আছে এখনও। পরীক্ষার পড়া মাথায় উঠেছে আমাদের। সমানে ঘরবার করছি।

মা এক সময় বললেন, "এক কাজ করগে না। কুণ্ডুমশাইকে জিজ্ঞেস করে আয় বউদি কেমন আছে।"

কুণ্ডুমশাইদের বাড়ির সদর দরজা ভেজানো। একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ভিতরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন কুণ্ডুমশাই। হাতে চায়ের কাপ-ডিশ ধরে। ডিশে খানকতক বিস্কুট। এক হাতে কাপ-ডিশ ধরে অন্য হাতে বিস্কুট নিয়ে চায়ে ভিজিয়ে খাচ্ছেন গভীর মনোযোগ সহকারে। আমার আসা টের পাননি।

বললাম, "মেসোমশাই, বউদি কেমন আছেন?"

চমকে উঠে তক্ষুনি সে ভাবটা সামলে নিয়ে ভুরু কুঁচকে কটমট করে তাকালেন।

আবার শুধোলাম, "বউদি কেমন আছেন মেসোমশাই? মা জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছেন।"

কুণ্ডুমশাইয়ের অমন সুপুরুষ চেহারা কেমন বিকৃত দেখাচ্ছিল।

নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে দুবার আওয়াজ করে তারপর অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "ভাল আছে। খুব ভাল আছে। তোমার মাকে গিয়ে বলগে বউদি একদম ভাল হয়ে গেছে। নাক ডাকিয়ে কষে ঘুম দিচ্ছে এখন।"

খানিক পরে বড়দা এসে খবর দিলো রূপেন্দুর বউ মারা গেছে।

উপসংহার

এরপর আরও ক'বছর কেটে গেছে। কুণ্ডুমশাই হেডমাস্টারের কাজ

থেকে অবসর নিয়েছেন। ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছেন ওঁরা। এ বউ সুন্দরী। আর ভারী দেমাকী। সর্বদা সেজেগুজে বসে থাকে। রূপেন্দু বাড়িতে এলেই তার হাত ধরে বেড়াতে চলে যায়। ফেরে সন্ধ্যে পার করে। সংসারের যাবতীয় খাটাখাটনি এখন কুণ্ডুমশাইয়ের স্ত্রীর ঘাড়ে। সংসারের সে সাচ্ছল্য আর নেই। বেশ টানাটানির আভাস পাওয়া যায় কুণ্ডুপরিবারের এখনকার জীবনযাত্রায়।

আমার পুতুলমামা সেবার প্রথম গর্দানিবাগে বেড়াতে এলেন। টাইফয়েডে ভুগে খুব কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। ভাবলেন কোলকাতার ভিড় ছেড়ে কিছুদিন বিহারে কাটালে হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পাবেন অচিরেই। সকাল বিকেল বায়ু সেবনে বেরোন। প্রথম ক'দিন যেতেন রিক্সায়, তারপর গায়ে বল ফিরে এলে হাঁটা পথেই বেরোতেন। একদিন বেড়িয়ে এসে ভারি উত্তেজিত কন্ঠে বললেন, "জানিস ওই সামনের বাড়ির কুণ্ডুরা, ওরা আমাদের পাড়ায় থাকতো আগে।"

"ওমা, তাই বুঝি? ওরা তো শুনেছি বিরাট বড়লোক !"

"বড়লোক না হাতি। সারাজীবন কেরানীগিরি করে এসেছে। রূপেন্দুটা তো থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতো। ওর দিদি ললিতা তো লেখাপড়াই শেখেনি মোটে ----।"

"ওমা, সেকি? তবে যে শুনলাম অম্বল-অজীর্ণতে ভুগছিলেন বলে বিহারে এসেছেন? বড়লোক না হলে ফট্ করে অমনি এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে আসতে পারে কেউ? অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে?"

পুতুলমামা হো হো করে হেসে উঠলেন, "অজীর্ণ? বটে! জানো, এক সময় রোজদিন জীর্ণ করার মত ভরপেট অন্ন জুটতো না ওদের। একদম ফাঁকা। সম্বলের মধ্যে ওই রাঙামুলোর মত রূপরঙের বাহারই শুধু।

"ডাক্তার সেন ওখানকার সেরা ডাক্তার। শুধু ডাক্তার হিসেবেই নাম নেই তাঁর, একেবারে দেবতুল্য মানুষ। কত লোকের কত উপকারই যে করেছেন ! ডাক্তার সেনের একমাত্র সন্তান উৎপলা। মা-বাপের নয়নের মণি। ভারি মেধাবী মেয়ে। কত উচ্চাশা জীবনে। ডাক্তার হয়ে দেশের গরীব দুঃখীর চিকিৎসা করে নিখরচায় নিরাময় করে তুলবে তাদের। ডাক্তার সেন সমানে উৎসাহ যোগান মেয়েকে। তাঁর এই অগাধ সম্পত্তি নিয়ে কোন ভাল কাজে নামুক মেয়ে। বিয়েথাওয়ার ইচ্ছে ছিল না

কোনকালে, তার বাবা-মাও সে আশা পোষণ করেননি কারণ উৎপলা স্বভাবগুণে রত্ন হলেও দেখতে সুন্দর ছিল না। তবে তার আত্মীয় বন্ধু চেনা পরিচিত সকলে তার গুণ ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল। তাকে স্নেহ করতো, ভালবাসতো সকলেই।

"কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরকম। হঠাৎ কবে কোথায় কিভাবে পাকেচক্রে কুণ্ডুমশাইয়ের রাঙামুলো ছেলের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ল। বাবা-মার অমতে বিয়ে করলো রূপেন্দুকে। মেয়ের মুখ চেয়ে বিয়েটা মেনে নিলেন ওঁরা। নানা উপঢৌকন নিয়ে রত্নে আভূষণে সজ্জিত হয়ে স্বামীর ঘর করতে এলো উৎপলা। স্বামীর স্বরূপ চিনতে পারলো। স্বামীর গোটা পরিবারের স্বরূপও। কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। উৎপলা মা হতে চলেছে। সন্তানের মুখ চেয়ে মাটির মত পায়ের নীচে নত হয়ে থেকেছে দীনতম দীন হয়ে। সেবা দিয়ে, প্রীতি দিয়ে তুষ্ট করতে চেয়েছে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের। তার বাবা-মা মেয়ের রূপের ঘাটতি ঢাকতে রাশি রাশি রূপো ঢেলেছেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। উৎপলার বাবাকে দোহন করা টাকায় গোটা সংসার বিলাস আর আভিজাত্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেও উৎপলার উপর নির্যাতন বেড়েই চলেছে ক্রমে। তারপর তো মরেই গেল মেয়েটা।

"অনেক থানা-পুলিশ, উকিলের দোরে ছুটোছুটি করেছিলেন ডাক্তার সেন, কিন্তু কিছুই হল না। উৎপলার মৃত্যুটা নাকি স্রেফ একটা দুর্ঘটনা, যার উপর কারোই হাত ছিল না।"

"আহা রে! অত আদরে যত্নে মানুষ হয়ে অত লেখাপড়া শিখে শেষপর্যন্ত এই পরিণতি হল তার! ওর বাবা মা নিশ্চয়ই একেবারে ভেঙে পড়েছেন?"

"ডাক্তার সেনকে দেখলে চেনাই যায় না আর। তাঁর স্ত্রীকেও। এখনও যে দাঁড়িয়ে আছেন সে শুধু নাতনি দু'টোর মুখ চেয়ে। ওদের গড়ে তুলতে হবে তো! সেরা স্কুলে ভর্তি করেছেন। দাদু-দিদিমার তদারকে বড় হচ্ছে তারা। দু'টি মেয়েই দারুণ মেধাবী আর ভারী নম্র, মিষ্টি স্বভাব। ঠিক উৎপলার মত। ডাক্তার সেন বলেছেন ওদের ডাক্তারী পড়াবেন। বিলেত পাঠিয়ে দেবেন। দেশে ফিরে এসে দেশের দীন দুঃখীদের সেবা

করবে, তাদের দুঃখ লাঘব করবে ওরা। এই বয়সেও তাই দু'বেলা প্র্যাকটিসে বসছেন ডাক্তার সেন। উৎপলার শ্বশুরবাড়ির খাঁই মেটাতে যা ক্ষয় হয়েছে তা পুরণ করে যাবেন। অগাধ সম্পত্তি রেখে যাবেন নাতনিদের নামে। যেন দেশের জন্যে কিছু করতে পারে দু'বোনে মিলে ----।"